দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 01 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্য
আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত

ড. আর এম দেবনাথ

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা কাটানোর কথা কলকাতায়। ২০১৫ সালের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের একজন আমন্ত্রিত অতিথি ছিলাম। অনুষ্ঠানটি প্রতিবছর করে থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড। এই অর্থে আমার মতো একজন চুনোপুঁটির জন্য এটা ছিল একটা বিরল সম্মান। দুঃখের বিষয় সকলের কপালে সম্মান বা সুখ সয় না। আমারও তাই। যখনই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখনই খারাপ খবর শুরু হয়। রুটিন চেকআপ করাতে গিয়েই ধরা খেয়ে গেলাম। ক্রিয়েটিনিন তিন দশমিক আট। আমার আপনজন স্বনামখ্যাত ডাক্তার সজল ব্যানার্জি বলল, দাদা সব কাজ বন্ধ, আগামীকাল হাসপাতালে ভর্তি হবেন। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। হাসপাতালের রোগী হয়েছি খুব কম। কিন্তু এবারের রোগটি তো মারাত্মক। কিডনি বলে কথা। তবে কী 'ডায়ালাইসিস' পর্যায়ে চলে যাবে সমস্যা। পরদিন যখন ভর্তির পর 'ক্রিয়েটিনিন' মাপা হলো তখন তা হুট করে উঠে পড়ে পাঁচ পয়েন্ট আট-এ। আমি প্রমাদ গুনি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা আশঙ্কার কথা ভাবি। দু'দিনও হয়নি আমার প্রিয় ছোট বোন মঞ্জু না বলে চলে গেল-ডায়াবেটিকে। মারা গেল কলকাতায়, জটিলতায় লাশটি আনা গেল না। আমার ছোট বেলার ফুল কুড়ানোর সাথী দীপালী নেই অনেকদিন। বলা যায় বিনা চিকিৎসায়। যে ঠাকুরদা (বড়ভাই) বৃহস্পতিবার বাজারের দিনে গভীর রাতে বাচামাছের ভাজা লাল মুলা দিয়ে খাওয়াতেন অতীব কষ্টে আগরতলায় গিয়ে এরশাদী অত্যাচারের মূল্য দিলেন। নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেলেন। যে বন্ধু বাণিজ্য কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটা কলেজ (সিটি কলেজ) দাঁড় করালেন সেই প্রিন্সিপাল হাফিজ নেই। ক্যান্সারে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি। তার সাইকেলই আমাদের স্মৃতি। ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ি তো দূরের কথা সাইকেল ছিল কয়েকজনের? দুইটা দশের ক্লাস। হাফিজ, আমি, সরোজ, রঞ্জিত, গফুর এক সাথে লাঞ্চ খাওয়া, জগন্নাথ হলে। এসব স্মৃতি নিয়ে ভাবছি হাসপাতালের বেডে। অতি সম্প্রতি সরোজটাও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্টিংয়ের প্রফেসর) চলে গেল। কত অভিমান তার সাথে, কথা বন্ধ, কথা শুরু, কত কিছু। ও গেল ক্যান্সারে। অথচ জীবনে সিগারেট খায়নি কোনদিন। কী কষ্ট দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বন্ধু ফিরোজ গেছে অনেক আগেই। অতি সম্প্রতি গেল 'মিঃ ইস্ট পাকিস্তান' বরিশালের ইসমাইল। এসবই বলা যায়, আজকের দিনের স্ট্যান্ডার্ডে অকাল মৃত্যু। হাসপাতালের বেডে বেডে রোগীদের 'আল্লাহ বাঁচাও' আর্তনাদ আমাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে তোলে। তবে কি বাড়ি ফেরা হবে না। কিডনি কি ফেইল করবে? 'ডায়ালাইসিস'-এর মতো ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় ঢুকতে হবে- ফতুর অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে। এসব দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, উদ্বেগ আর পাশাপাশি দুই ছোট নাতি-নাতনির কথা। একবার ভাবি, না কিছুই হবে না, আবার বাড়ি ফিরে অদ্বিতীয়া ও রণজয়ের ঝগড়া মেটাব- পুতুল নিয়ে ঝগড়া, রোবট গাড়ি নিয়ে ঝগড়া। মনটা মাঝে মাঝে বিষণ্ন হয়ে যায়। জানালার পাশেই আমার কেবিন নং- এক। তাকালেই দেখি শত শত উদ্বেগাকুল আত্মীয়-পরিজন যাদের রোগীরা ভর্তি হৃদরোগ বিভাগে। আমিও এখানে। আমি প্রথমত হৃদরোগী, নতুন উপসর্গ কিডনি। আতঙ্কিত, উদ্বেগাকুল সাধারণ ভিজিটরদের চেহারার দিকে তাকানো যায় না। দিনে দু'একটা লাশ যাচ্ছে। স্বজনদের কান্নার দৃশ্য বর্ণনার অতীত। এরই মাঝে ডাঃ সজল আসেন সঙ্গে তার কত ছাত্র, উৎসুক ছাত্র- তারা জানতে চায়, বুঝতে চায় সিনিয়র প্রফেসরের কাছ থেকে। আমি শুনি। ডাঃ সজল যখনই আমার পিঠে হাত রেখে বলে দাদা, কিছু ভাববেন না, আপনি ভাল হয়ে ফিরবেন। আশ্বস্ত হই। আবার অসহায় হয়ে পড়ি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বন্ধুবর কামরুল ভাই প্রতিদিন আসেন। আমাকে সাহস যোগান। সুখের দিনের স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সদাহাস্য তিনি, কড়া প্রশাসক। আমি আশ্বস্ত হই। হাসপাতালের সিস্টাররা আসেন, কাঁটায় কাঁটায় আগমন। খাওয়ার আগের ওষুধ, খাওয়ার পরের ওষুধ মাফ নেই। বাংলাদেশে নার্স পেশা এত উন্নত হয়েছে আমার জানা ছিল না। 'গুড মর্নিং' বলে তারা ঢোকে। আঙ্কল কেমন আছেন বলে সম্বোধন করেন। একা আসেন না। দলে দলে তারা আসেন। প্রেসার মাপছেন একজন, ইনজেকশন দিচ্ছেন একজন, ইসিজি করছেন একজন। জিজ্ঞেস করলাম- এমন কেন? তাদের উত্তর 'সিরিয়াস' পেসেন্ট ভর্তি এখন সেই তুলনায় সিস্টার কম। তাই মনোযোগ দিতে গিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। নার্সের সংখ্যা কম। কিন্তু আমি অভিভূত কার্ডিওলজি বিভাগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লিনাররা পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে। একটা ডাকও দিতে হয় না। অবিশ্বাস্য কান্ড। সরকারী হাসপাতাল। এটা কী করে সম্ভব? দেখলাম উপাচার্য কামরুল হাসান খান ও কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান স্বল্পভাষী ডাঃ সজল ব্যানার্জির প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। নেতৃত্ব যে একটা প্রধান বিষয় এটা পরিষ্কার। সরকারী হাসপাতালের টয়লেট, বাথরুম, ওয়াশরুমে যাওয়া যায় না। না, অদ্ভুত ব্যাপার এখানে তা ভিন্ন। সর্বদা টয়লেট পরিষ্কার। যেন ভূতে করে যাচ্ছে। ছোটবেলায় বাপ-দাদার কাছে শুনেছি কারও বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই যাবে বাথরুমে। বাথরুম পরিষ্কার থাকলেই বোঝা যাবে বাড়ির সাংস্কৃতিক মননটা কী? তারপর দেখবে রান্নাঘর। বাহ্যিক পোশাক-আশাক কিছুই বলে না। আসল সংস্কৃতি হলো ওই জায়গায়। এই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তবে এখানে মন খারাপের একটা দৃষ্টান্ত আছে। ক্লিনারদের দুজনকে দেখলাম আউট সোর্সিংয়ের লোক। ওরা বলল, তাদের কোম্পানি নাকি মাত্র তিন হাজার টাকা বেতন দেয়। সারাদিন খাটায়। ছুটি দেয় না। এসবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নয়। এটা আমাদের দেশে নতুন একটা উৎপাত। বাজার অর্থনীতির নামে যে অনাচারের অর্থনীতি শুরু হয়েছে সেখানে 'আউট সোর্সিং' নামের একটা আপদ ঢুকেছে শ্রমিকদের ঠকানোর জন্য। যাক এটা ভিন্ন বিষয়।

আমার এবার মূল রোগ কিডনি সম্পর্কিত। দেখতে এলেন প্রখ্যাত নেফ্রোলজিস্ট প্রফেসর ডাঃ রফিকুল আলম।

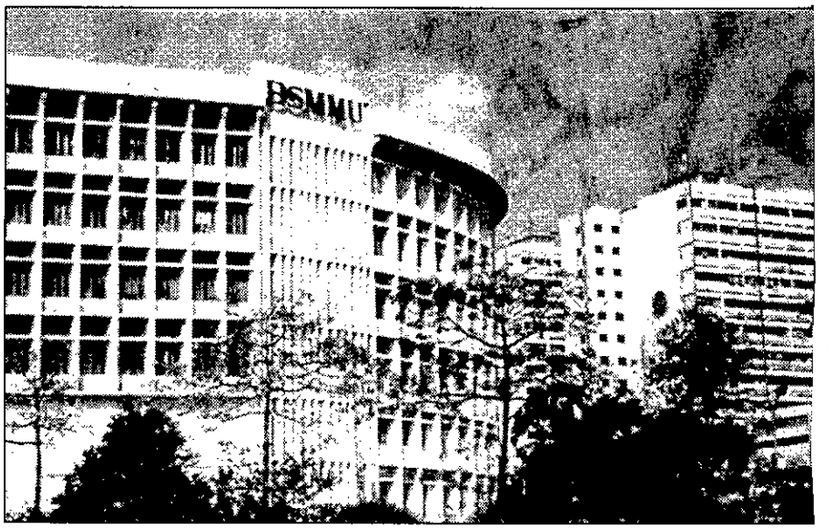

আমরা যখন ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারে যাই তখন অনেকের অনেক অভিযোগ থাকে। কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তারদের আমি পেলাম বন্ধু হিসেবে। রফিক ভাই তো হেসে হেসে সব সমস্যা আমাকে বোঝাতে ব্যস্ত ছিলেন। তার সঙ্গে একদল জুনিয়র ডাক্তার। তারাও প্রশ্নবাণে জর্জরিত। এটা কেন হলো, ওটা কেন একজন হলো- সিনিয়রের প্রশ্ন। এতে আমার লাভ হয়েছে একটি। আমি যা বুঝি না তা বুঝতে সক্ষম হলাম। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম ডাক্তাররা বিভিন্ন শ্রেণীর। কেউ কেউ হাসপাতালের নিজস্ব স্টাফ, কেউ কেউ ডেপুটেশনে এসেছেন, কেউ ট্রেনিংয়ে এসেছেন, কেউ ডিগ্রী করতে এসেছেন। তারা ঘুরছেন এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। দেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, বিশাল প্রতিষ্ঠান। কাজের শেষ নেই। রোগ ও রোগের প্রকৃতি ভেদের অভাব নেই। অথচ শিক্ষার সুযোগ এখানে অফুরন্ত। সবচেয়ে বড় সুবিধা ছাত্রদের একটা। দেশের সেরা ডাক্তার সব এখানে। সিনিয়ররা সবাই যার যার ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। অতএব ছাত্রদের এটি একটি মহাসুযোগ। বলা হয়, বঙ্গবন্ধু হাসপাতালে রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি। এটা দোষের কিছু নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তাররা সিনিয়রদের সঙ্গে থেকে এক্সপার্টিজ ডেভেলপ করেন। জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে আমি আলোচনার একটা আলামত দেখেছি। তারা নিজেরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।
করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়ে
বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শী
অধ্যাপক ড. আ আ ম স উ
অধিবেশনে এই নিন্দা প্রস্তা
ড. সরফুদ্দিন। তার এই প্র
বুলবুল এবং মাহফুজা খানম

চট্টগ্রামে শেষ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শেষ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেল এমএ আজিজ স্টেডিয়া আউটার স্টেডিয়ামে ত মেলায় প্রতিদিনই ছি হাজার মানুষের বৃহস্পতিবার রাতে পরিসমাপ্তি ঘটেছে এ মে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা চেয়ারম্যান সাবেক মেয় মহিউদ্দিন চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মে জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সুরক্ষার আদর্শি মেলা বাঙালীকে ঐক্যব প্রেরণা যুগিয়েছে এবং অবিনাশী চেতনাকে পরম্পরায় ধারণ করে তিনি আরও বলেন, গর্বিত অতীতকে ধা বর্তমানকে সমৃদ্ধ ক ভবিষ্যতের দিকে এগি হবে। এ এগিয়ে যাও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রান্ত থেকে আসা ব্যব উদ্যোক্তা, চারু ও উৎপাদক এবং দেশীয় পণ্য বিক্রেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনারাই এই আয়োজ উপকরণ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিজয় আয়োজনের নেপথ্যে কোন ব্যবসায়িক মনো ক্রেতারা এখানে স্বল্প মূ কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি পেয়ে খ সারা বছর এই মেলার মুখিয়ে থাকেন। তাই সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা কো-চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর চৌধুরীর সভা মহাসচিব মোঃ ইউ